মাঠকর্ম গবেষণা প্রতিবেদন

টাঙ্গাইলের প্রত্ননিদর্শন: ইতিহাস ও সমীক্ষা।

কোর্স নং: ৪০৯

ভ্রমণ তারিখ: ২০/১২/২০২৩

জমাদানের তারিখ: ১৫/০১/২০২৪

গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক:

ড. এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, অধ্যাপক।
ড. আরিফা সুলতানা, অধ্যাপক।
মাসুদা পারভিন, সহযোগী অধ্যাপক।
ড. পিংকী সাহা, সহযোগী অধ্যাপক।
ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

প্রতিবেদক:

পরীক্ষার রোল: ১৯০৫২৮
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার: ২০১৯১৬৪৯২১০
৪র্থ বর্ষ, স্নাতক (সম্মান)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯
ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

অঙ্গীকারনামা:

আমার গবেষণা কর্মটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক সম্মান ৪র্থ পর্বের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ৪০৯ নং ফিল্ড স্টাডি কোর্সের অধীনে টাঙ্গাইল জেলার মহেরা জমিদার বাড়ি ও আতিয়া মসজিদের ইতিহাস সম্পর্কিত মাঠকর্ম-প্রতিবেদন। এ প্রতিবেদনটি আমার মাঠকর্ম গবেষণার মৌলিক প্রতিফলন। আমার প্রতিবেদনটির কোন অংশ নকল বা প্রতিলিপি থেকে তৈরি করা হয়নি এবং এই প্রতিবেদনটি আমার একান্ত গবেষণার ফল। তবে, প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিবেদক:
পরীক্ষার রোল: ১৯০৫২৮
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার: ২০১৯১৬৪৯২১০
৪র্থ বর্ষ, স্নাতক (সম্মান)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯
ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

উৎসর্গ:

আমার সর্বক্ষেত্রের প্রেরণাদাতা ও পথপ্রদর্শক আমার দাদাভাই ফজলুল কবিরকে উৎসর্গ করে আমার প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করছি।

মুখবন্ধ:

বহু প্রাচীনকালে মানব সভ্যতা গড়ে ওঠে যা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে । মানুষ নিজের অজান্তেই তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র বা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার অতীতের প্রমাণাদি রেখে গেছে। আর ইতিহাস চর্চার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীত মানুষের কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার পথ উদ্ঘাটন করা। ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানা ও পূনর্গঠনের জন্য একজন ঐতিহাসিক কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে থাকেন । শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে বসে এ সকল উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য মাঠকর্মের গবেষণা আবশ্যক।

আমি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়ায় মাঠকর্ম গবেষণার সুযোগটি পেয়েছি। এই প্রতিবেদনটি টাঙ্গাইল জেলার আতিয়া মসজিদ, মহেরা জমিদার বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক স্থাপনার উপর সম্পাদিত।

প্রতিবেদনটিতে টাঙ্গাইল জেলার আতিয়া মসজিদ, মহেরা জমিদার বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক স্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের প্রাচীন ইতিহাস জানার মত তথ্য-উপাত্ত একান্তই অপ্রতুল। ফলে একজন নবাগত ইতিহাস অনুসন্ধানকারী এর পক্ষে সহজে বিলুপ্তপ্রায় স্থাপনার সার্বিক অবস্থা বুঝে ওঠা কঠিন । ফলে মাঠকর্ম গবেষণায় নির্ধারিত প্রত্ননিদর্শন এর একটি সামগ্রিক পরিচিতি সংক্ষেপে সর্বজনবোধ্য ভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে। বর্ণনার সব স্তরে এ বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে যে পাঠক বা দর্শক যেন বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা থেকে বিমুক্ত থাকতে পারেন। যদিও প্রতিবেদনটি নির্ভুলভাবে সম্পাদনা করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি। তথাপি অনিচ্ছাকৃত ও মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ভ্রান্তি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদক:
পরীক্ষার রোল: ১৯০৫২৮
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার: ২০১৯১৬৪৯২১০
৪র্থ বর্ষ, স্নাতক (সম্মান)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯
ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

সর্বপ্রথমে আমি আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছি। এই কথা সত্য যে দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুসন্ধান, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়। এই দিক বিবেচনা করে আমাদের মাঠকর্মটি ছিল দলগত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদের এই মাঠকর্ম গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ-

- অধ্যাপক এ.টি.এম. আতিকুর রহমান স্যার
- অধ্যাপক আরিফা সুলতানা ম্যাম
- সহযোগী অধ্যাপক, মাসুদা পারভীন ম্যাম
- সহযোগী অধ্যাপক পিংকী সাহা ম্যাম

প্রত্যেক শিক্ষকই মাঠকর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে -স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, প্রত্ন নিদর্শনের শিল্পশৈলী ও নকশা এবং প্রত্নস্থানের ইতিহাস সহ কিভাবে আমরা প্রত্নস্থান থেকে নানাবিধ সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারি সে বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে আমাদের মাঠকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করেন। তাই তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টাঙ্গাইল জেলার আতিয়া মসজিদের মুয়াজ্জিন রফিকুল ইসলাম এবং স্থানীয় তিনজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের মাঠকর্ম গবেষণায় মৌখিক সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় আতিকুর রহমান স্যার টাঙ্গাইলের প্রত্নস্থান মহেরা জমিদার বাড়ি ও আতিয়া মসজিদের মাঠকর্ম সম্পাদনের পরদিন আমাদের একটি নির্দেশনা মূলক ক্লাস নিয়ে সেখানে মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির একটি সুশৃংখল নিয়মাবলী বুঝিয়ে দেন। যা আমাদের মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। তাই শ্রদ্ধেয় আতিকুর রহমান স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র:

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভৌগলিক অবস্থান ও স্থাপনা পরিচিতি

ভূমিকা

১.১- আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ বর্ষের স্নাতক সম্মান ইতিহাস বিভাগের একজন শিক্ষার্থী। আমি আমার মাঠকর্ম অনুশীলনের উপর একটি প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, ইতিহাস বিভাগের তত্ত্বাবধানে আমরা চতুর্থ বর্ষের স্নাতক সম্মান শিক্ষার্থীদের ৪০৯ নং কোর্সের অংশ হিসেবে মাঠকর্ম অনুশীলনের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। যার ফলাফল এই মাঠকর্ম প্রতিবেদন। এক্ষেত্রে মাঠকর্ম গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রথমে রাঙামাটি ও বান্দরবান দুটি স্থান স্থির করা থাকলেও আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৩ কে সামনে রেখে যে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাতে উক্ত স্থানগুলোর পরিবর্তে ঢাকার নিকটবর্তী টাঙ্গাইল জেলাস্হ জমিদার বাড়ি ও আতিয়া মসজিদের মধ্যে আমাদের মাঠকর্ম অনুশীলন সম্পন্ন করা হয়।

টাঙ্গাইল যাওয়ার উদ্দেশ্যে ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ ভোর ৭:০০ টায় আমি ও আমার সহপাঠীরা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়গণ সকলে নতুন কলা ভবনের সামনে মিলিত হয়ে এবং বাস যাত্রা করে ৮:৩০ মিনিটে। এবং আমরা সকাল **১১** টা নাগাদ টাঙ্গাইল জেলাস্হ মহেড়া বাড়িতে প্রবেশ করি। এরপর আমরা দুপুর ৩.০০টা নাগাদ আতিয়া মসজিদ প্রবেশ করি।

আমাদের শিক্ষকদের নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠকর্ম গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রত্নানিদর্শন: ইতিহাস ও সমীক্ষা।শিক্ষকদের নির্দেশনা মত আমরা আমাদের গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করি।এ কার্যক্রমে বিষয়বস্তু হিসেবে -
১. টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদের প্রস্তুতকারকের বিবরণ, এই মসজিদেকে ঘিরে যে ইতিহাস বা অতীত বর্ণনা আছে সে সম্পর্কে বিবরণ, এর গঠন প্রণালী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের স্থাপত্যশৈলী সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও তথ্য সংগ্রহ করা।
২. মহেরা জমিদার বাড়ির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জানা যে সংশ্লিষ্ট জমিদার জমিদার পরিবার ও তাদের ভিন্ন বিবরণ জানা এতে এটি মুক্তিযুদ্ধের সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বিষয়ে জানা ও তথ্য সংগ্রহ করা।

১.২- **ইতিহাস গবেষণার লক্ষ্য,উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি:** আমার গবেষণা কর্মের আসল উদ্দেশ্য হল ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানা ও সত্য অনুসন্ধান করা।ইতিহাস হলো অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা বা অনুসন্ধান চালিয়ে সত্য উপস্থাপন করা। আবার ইতিহাস হচ্ছে অতীত সমাজের অভিজ্ঞতা অর্জন । তাই উল্লেখিত প্রশ্নস্থানগুলো থেকে প্রত্নানিদর্শনের সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করে ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে অতীত সমাজ, মানব জীবনের ইতিহাস জানা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে এই মাঠকর্ম গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- এই গবেষণাকর্মে - প্রত্ন নিদর্শনগুলোর বর্তমান অবস্থা, এগুলো কি অবস্থায় আছে, কতদিন টিকে থাকবে, কিভাবে এগুলো সংরক্ষণ করে রাখা যায় এসব বিষয়ে সমীক্ষা বা অনুসন্ধান করা আমাদের মাঠকর্ম গবেষণার উদ্দেশ্য।
- এই মাঠকর্ম গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করা হয়েছে, তথ্যের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও সত্যতা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে আমার প্রতিবেদনটি সুশৃংখল নিয়মে তৈরি করা যায়।
- সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে আমার মাঠকর্ম প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রত্নানিদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ করে সংগ্রহ করা হয়েছে(যা গ্রন্থপঞ্জিতে সংযুক্ত আছে), বিভিন্ন লিখিত উৎস (সাইনবোর্ড, খোদাইকৃত লেখা,মিউজিয়ামের সংরক্ষিত তথ্য) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ইন্টারনেট (google, বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য সাইট) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক রনি স্যারের রিসার্চ পেপার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা আমার গবেষণা প্রতিবেদনটিকে স্বতঃস্ফূর্ততা দান করেছে।
- আমার প্রতিবেদনটি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে প্রত্যক্ষভাবে মাঠকর্ম পরিচালনা, পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহ। আমরা প্রথমে মহাড়া জমিদার বাড়ির দালানসমূহ, এর গঠন প্রণালী, নকশা, শিল্প শৈলী, ছাদের গঠন, দালানের পেছনের অংশ, মন্দির, অতিথি ভবন এবং মিউজিয়াম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যা এই প্রত্নস্থানের সুনির্দিষ্ট ও সত্য তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক হয়েছে।

তারপর দুপুরের ভোজন সম্পন্ন করে আমরা মুঘল যুগের সুনিপুন টেরাকোটায় আবৃত আতিয়া মসজিদ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করি। মধ্যযুগীয় এই স্থাপত্যটির গঠনশৈলী ও অপরূপ নকশা ছিল নজরকাড়া। এর পার্শ্ববর্তী সওদাগরী মসজিদ সম্পর্কেও আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়।

১.৩- গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে আমি ৩-৪ জন স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার প্রদান করেন -

১.আতিয়া মসজিদের মুয়াজ্জিন রফিকুল ইসলাম, বয়স- ৫০ বছর।

২. আব্দুর রসুল, বয়স- ৮০ বছর।

৩. স্থানীয় আরও ২ জন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। যার মধ্যে একজন আতিয়া মসজিদ ও অন্যজন পার্শ্ববর্তী লৌহজং নদীর তীরবর্তী অতি ক্ষয়িষ্ণু সওদাগরি মসজিদ স্থাপনের কারণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন।যা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে আমার প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে

১.৪- আমার মাঠকর্ম প্রতিবেদনটি ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১.প্রথম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে -ভূমিকা, ইতিহাস গবেষণার পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; ভৌগলিক অবস্থা ও স্থাপনা পরিচিতি - যেখানে প্রত্নস্থানগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.তৃতীয় অধ্যায়ে - স্থাপনা নির্মাণশৈলী ও বৈশিষ্ট্য - যেখানে প্রত্নস্থান এর গঠন প্রণালী, কারুকাজ, শিল্প শৈলী তুলে ধরা হয়েছে।

৩.চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে -সুপারিশ মালা ও উপসংহার- প্রত্নস্থানের সুরক্ষায় গৃহীত উপায় যথেষ্ট কিনা, আর কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত এ সম্পর্কে আমার মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এবং একটি উপসংহার আছে যাতে প্রত্ন নিদর্শন দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

৪. এরপর পরিশিষ্টতে কিছু ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এবং গ্রন্থপঞ্জির তালিকা যুক্ত করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান ও স্থাপনা পরিচিতি



চিত্র: মানচিত্রে টাঙ্গাইলের ভৌগোলিক অবস্থান

টাঙ্গাইল জেলার অবস্হান:

টাঙ্গাইল জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত যা ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এর জনসংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ এবং আয়তন ৩৪১৪.৩৫ বর্গ কিলোমিটার। টাঙ্গাইল আয়তনের ভিত্তিতে ঢাকা বিভাগের সর্ববৃহৎ এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২য় সর্ববৃহৎ জেলা। এই জেলা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং এর মাঝ দিয়ে লৌহজং নদী প্রবাহমান।

টাঙ্গাইল জেলার নামকরণ:

টাঙ্গাইলের নামকরণ বিষয়ে রয়েছে বহু জনশ্রুতি ও নানা মতামত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেল তার মানচিত্রে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলকেই আটিয়া বলে দেখিয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে টাঙ্গাইল নামে স্বতন্ত্র স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামটি পরিচিতি লাভ করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর দপ্তর আটিয়া থেকে। টাঙ্গাইলের ইতিহাস প্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলে এদেশের লোকেরা উঁচু শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছিল টান আইল। আর সেই টান আইলটি রূপান্তরিত হয়েছে টাঙ্গাইলে।

আবার তরুণ গবেষক, ইতিহাসবিদ, অনুবাদক জনাব খুররম হোসাইন তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, সুবাদার শায়েস্থা খানের অসাধারণ কুটবুদ্ধি আর প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল। মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করা যখন কোন ক্রমেই সম্ভব হচ্ছিলো না তখন তাঁর চিন্তায় আসে দক্ষিণ ভারতের মালাবর অঞ্চলের মোপলাদের কথা। সমুদ্র পাড়ের এই সব মোপলা, যারা অসম সাহসী যোদ্ধা, সম্মুখ যুদ্ধে যারা কখনও পিছু হটে না, সেই সব মোপলাদের নিয়ে এলেন। জলদস্যুদের উৎপাত যখন কিছুটা দমিত হলো তখন তাদের বসতির স্থান নির্ধারণ করলেন বর্তমান টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিম প্রান্তে। মোপলাদের ধর্ম গুরুকে তারা নিজস্ব ভাষায় 'তাংগাইল' বলে। টাঙ্গাইলে এই মোপলা সম্প্রদায় আজও টিকে আছে। এই অঞ্চলের যারা নিজেদের পরিচয় দেয় মাহিফরাস বলে। মৎস্য ব্যবসা যাদের প্রধান জীবিকা। টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকজন তাদেরকে নিকারি বলে জানে। পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলো বিচার করে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মোপলাদের সর্দারকে যে স্থানে জায়গা দেয়া হয়েছিল সেই স্থানটিই ক্রমে টাঙ্গাইল নামে পরিচিত হতে থাকে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন ২০১৪: এক নজরে টাঙ্গাইল জেলা)

পূর্বে টাঙ্গাইল অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চল ছিলো। এখানকার মানুষ বসবাসের জন্য মাটির উপর বাঁশ পুঁতে টং ঘর নির্মাণ করতো। টং ফরাসী শব্দ, অর্থ হলো উঁচু। অতীত সময়ে স্থানীয় অনার্য বাসিন্দারা বাসস্থানকে 'ইল'বলতো। তাই কারো কারো মতে এই টংইল (উঁচু বাসস্থান) থেকে টাঙ্গাইল নামের উৎপত্তি।

ইতিহাসবিদ মুফাখখারুল ইসলামের মতে, কাগমারি পরগণার জমিদার ইনাযাতুল্লাহ খাঁ চৌধুরী (১৭০৭-১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ) লৌহজং নদীর টানের আইল দিয়ে কাগমারী আধামাইল দূরে খুশনুদপুরে (খুশির জায়গা, যার সংস্কৃতায়ন করলে-সন্তোষ) তাঁর সদর কাচারিতে যাতায়াতে করতেন। এই টানের আইল বা টান আইল বলে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হতে হতে টাঙ্গাইল নামকরণ হয়েছে।

টাঙ্গাইলের দর্শনীয় স্থান:

টাঙ্গাইলের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আছেঃ ভারতেশ্বরী হোমস, মহেড়া জমিদারবাড়ি/পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, পাকুল্লা মসজিদ, আরুহা-শালিনাপাড়া কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ, আতিয়া মসজিদ, দোখলা ভিআইপ রেস্ট হাউস, পীরগাছা রাবারবাগান, ভূঞাপুরের নীলকুঠি, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, শিয়ালকোল বন্দর, ধনবাড়ী মসজিদ ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি স্থান: আতিয়া মসজিদ ও মহেরা জমিদার বাড়ি আমাদের মাঠকর্মের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

আতিয়া মসজিদ:



চিত্র: আতিয়া মসজিদ

অবস্থান: টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে দেলদুয়ার উপজেলার অন্তর্গত আতিয়া গ্রামে লৌহজং নদীর পূর্ব পারে আতিয়া মসজিদ অবস্থিত। এটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক মসজিদ যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।এখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায় করা হয়।

নামকরণঃ আতিয়া নামটি কেমন করে এলো তার সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও একটি সম্ভাব্য উত্তর বের করা যায়। আতিয়া আরবি 'আতা' শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ হল 'দান'। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে এ অঞ্চলে শাহ বাবা কাশ্মিরি নামে বিখ্যাত এক ধর্ম প্রচারক সুফি আগমন করে বসবাস করে থাকেন এবং ১৫০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই সাধকের মাজার এই আতিয়াতে অবস্থিত। তিনি ঐ সময় কাররানি শাসক সোলাইমান কাররানির কাছ থেকে তার ধর্মীয় কার্য পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য বিশাল একটি এলাকা ওয়াকফ হিসেবে পান। বলা হয় যে, তাকে এ এলাকা দান করা হলে এ দান বা আতা থেকে সম্ভবত এ পরগনার নাম 'আতিয়া' হয়েছে।

নির্মাণকালঃ মসজিদের নির্মাণকাল নির্দিষ্ট রূপে বলা কষ্টকর। কারণ মসজিদের পূর্ব ফাসাদের প্রধান প্রবেশ পথের উপর যে শিলালিপি বর্তমানে আছে তা মসজিদের আদি শিলালিপি নয়। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত পন্নি পরিবারের কেউ এ শিলালিপি তৈরি করে লাগিয়ে দেন।

এছাড়া ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোতেও এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমানে ধারনকৃত শিলালিপি অনুযায়ী আতিয়া পরগনার জমিদার সাইদ খান পন্নি ১৬০৯ সালে এটা নির্মাণ করেন। তবে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত একটি শিলালিপি যা টাঙ্গাইলের করটিয়া অঞ্চলে পাওয়া গেছে, তাতে উল্লেখ আছে হিজরি ১০১৯ সনে অর্থাৎ ১৬১০-১১ খ্রি. সাইদ খান পন্নি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নির্মাতার নাম একই আর যেহেতু ঐ সময়ে নির্মিত অন্য কোনমসজিদ টাঙ্গাইল অঞ্চলে পাওয়া যায় না; একারনে মনে করা যেতে পারে এটায় আতিয়া জামে মসজিদে হারানো শিলালিপি। মসজিদটির স্থপতি মুহাম্মদ খাঁ।

সওদাগরি মসজিদ

অবস্থানঃ সওদাগরি মসজিদটি টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৬.৫ কি.মি. দক্ষিন- পশ্চিমে লৌহজং নামক একটি মৃত নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এ মসজিদটি আতিয়া জামে মসজিদের মাত্র ৯১ মি.(২০০হাত) দূরে অবস্থিত।

নির্মানকালঃ কোন স্থাপত্যের নির্মাতা ও নির্মাণকাল জানতে পারা যায় ঐ স্থাপত্যের শিলালিপি থেকে। এই মসজিদের কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাতা ও নির্মাণকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। প্রচলিত জনশ্রুতি আছে যে, কোন এক সওদাগর ব্যবসার উপলক্ষে লৌহজং নদী দিয়ে এখানে আসেন এবং এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

নামকরণ: নির্মানকারী সওদাগরের নাম জানা যায় না।তাই এ মসজিদটির নাম সওদাগরী মসজিদ রাখা হয়।



চিত্র: সওদাগরি মসজিদ

মহেড়া জমিদার বাড়ি:

বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল সদর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে প্রায় আট (৮) একর জায়গা জুড়ে এই মহেড়া জমিদার বাড়ি বিস্তৃত। ঢাকা - টাংগাইল মহাসড়কে নাটিয়াপাড়া বাজার হতে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার পূর্বে মহেড়া জমিদার বাড়ি অবস্থিত।

নির্মাণকাল: স্পেনের করডোভা নগরীর আদলে জমিদার বাড়ীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮৯০ দশকের দিকে জমিদার বাড়ীটির পত্তন ঘটে। কালীচরণ সাহা ও আনন্দ সাহা নামে দুই ভাই কোলকাতায় লবণ ও ডালের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করে চলে আসেন মহেড়া গ্রামে। মহেড়া গ্রামে তারা ১ হাজার ১৭৪ শতাংশ জমির ওপর এ সুবিশাল বাড়িটি নির্মাণ করেন।

নামকরন: মহেরা গ্রামে অবস্থিত বলে এর নাম হয় মহেরা জমিদার বাড়ি। তবে এই জমিদারবাড়ির প্রাসাদগুলোর আলাদা নাম আছে। যেমন: মহারাজ লজ, আনন্দ লজ, চৌধুরী লজ, কালীচরণ লজ।



চিত্র: মহেড়া জমিদার বাড়ির সিংহদ্বার

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাঙ্গাইলের পরিদর্শনকৃত প্রত্নস্থানগুলোর ইতিহাস

টাঙ্গাইলের পরিদর্শনকৃত প্রত্নস্থানগুলোর ইতিহাস

টাঙ্গাইলের পরিদর্শনকৃত প্রত্নস্থানগুলো হল: আতিয়া মসজিদ, সওদাগরি মসজিদ, মহেরা জমিদার বাড়ি।

আতিয়া মসজিদের ইতিহাস:

পঞ্চদশ শতকে আতিয়া অঞ্চলে আদম শাহ্ বাবা কাশ্মিরী নামে বিখ্যাত এক সুফি ধর্মপ্রচারক আগমন করে বসবাস করতে থাকেন এবং ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই সাধকের মাজার এই আতিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ কর্তৃক আতিয়ার জায়গিরদার নিযুক্ত (১৫৯৮ সালে) হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ঐ সময় কররানী শাসক সোলাইমান কররানীর কাছ থেকে তাঁর ধর্মীয় কার্য পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য বিশাল একটি এলাকা বা মহাল ওয়াকফ্ হিসাবে পান। তাঁকে এ এলাকা দান করা হলে এ দান বা 'আতা' থেকে সম্ভবত এ পরগণার নাম 'আতিয়া' হয়েছে। শাহ্ বাবা কাশ্মিরীর বৃদ্ধ বয়সে, তাঁর পরামর্শে প্রিয় ভক্ত সাঈদ খান পন্নীকে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর আতিয়া পরগণার শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। এই সাঈদ খান পন্নীই করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। সাঈদ খান পন্নী ১৬০৮/১৬০৯ সালে আতিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি দেলদুয়ার উপজেলা তথা টাঙ্গাইল জেলার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। সুলতানি ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্পরীতির সমন্বয়ে নির্মিত এ মসজিদের পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত স্থপতি মুহাম্মদ খাঁ।

সংস্করণের ইতিহাস: রওশন খাতুন চৌধুরানী ১৮৩৭ সালে ও আবুল আহমেদ খান গজনবি ১৯০৯ সালে মসজিদটি সংস্করণ করেন। বাংলাদেশ সরকার মসজিদটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে চুনকামের অভাব, অবহেলা, অযত্নে হারাতে বসেছে ৪০০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য।

টাকায় আতিয়া মসজিদ: বাংলাদেশের পুরোনো দশ টাকার নোটে রয়েছে আতিয়া জামে মসজিদটির ছবি। যার জন্য মোটামুটি সবার কাছে পরিচিতি আতিয়া জামে মসজিদটি। আতিয়া মসজিদের নাম একবার হলেও শোনেনি এমন ব্যক্তি হয়তো খুঁজে পাওয়া দুর্লভ।

সওদাগরী মসজিদের ইতিহাস:

আতিয়া মসজিদের মুয়াজ্জিন রফিকুল ইসলাম(বয়স ৪০) এর মৌখিক তথ্য থেকে আমরা সওদাগরি মসজিদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন একজন লবণ ব্যবসায়ী। জনশ্রুতি মতে এই লবণ ব্যবসায়ীর পণ্য বোঝা জাহাজ লৌহজং নদীতে ভেসে গেলে তিনি এ পন্যবাহী জাহাজ ফিরে পাওয়ার জন্য লৌহজং নদীর তীরে একটি মসজিদ নির্মাণের মানত করেন। যার ফলশ্রুতিতে এই সদাগরী মসজিদটি নির্মিত হয়। এই মসজিদটি আতিয়া মসজিদের সমসাময়িক। তবে আতিয়া মসজিদের কাজ এর আগেই সম্পন্ন হয় বলে জানা যায় । এ মসজিদটি অনেক আগে থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এর কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। এই মসজিদে জুমা'র নামাজ কখনো পড়া হতো কিনা জানা যায় না যেখানে আতিয়া মসজিদে বহু আগে থেকেই জুমার নামাজ আদায় করা হয়।

মহেড়া জমিদার বাড়ির ইতিহাস:

প্রকৃতির অনিন্দ্য নিকেতন মহেড়া জমিদার বাড়ী অপরূপ সৌন্দর্যে নয়নাভিরাম। তার রূপশোভা বিস্তার করে কালের নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এক উজ্জ্বল ভাস্কর্য। নিভৃত পল্লীতে ছায়াঘেরা, পাখী ডাকা নির্মল নির্ঝর শান্ত পরিবেশ আকুল করে দর্শকদের। আগন্তুককে একবার নয় বারবার এই সৌন্দর্য দেখার হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানায় এখানকার রকমারি দেশী-বিদেশী ফুলের সমারোহ ও সুশোভন বাহারী পাতাবাহার দ্বারা পরিবেষ্টিত ফুলের বাগান। গাছে গাছে সকাল সন্ধ্যা পাখির কলকাকলিতে মুখর, সৌম্য-শান্ত কোলাহলমুক্ত পরিবেশ দেয় এক অন্যরকম ভ্রমানুভুতি। চারদিকে নানা বৈচিত্র্যের ফুলের বর্ণ ও গন্ধের সমারোহ যেন নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য। এক কথায় যেন ধরায় স্বর্গধাম।

ধারনা পাওয়া যায় স্পেনের করডোভা নগরীর আদলে ভবনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালের বিবর্তনে ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে শোভিত হয়ে উঠে কালের স্বাক্ষী এ দৃষ্টিনন্দন জমিদার বাড়ী।



চিত্র: বিশাখা সাগর

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮৯০ দশকের পূর্বে জমিদার বাড়ীটির পত্তন ঘটে। কালীচরণ সাহা ও আনন্দ সাহা নামে দুই ভাই কলকাতায় লবণ ও ডালের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করে চলে আসেন মহেড়া গ্রামে। মহেড়া গ্রামে তারা ১ হাজার ১৭৪ শতাংশ জমির ওপর এ সুবিশাল বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়ি নির্মাণ করার পর তারা মহেড়া গ্রামের গরির মানুষের কাছে টাকা দাদন খাটাতে থাকেন এবং এলাকার প্রভুত উন্নতি করেন। পরে ব্রিটিশ সরকার জমিদার প্রথা চালু করলে কালীচরণ সাহা ও আনন্দ সাহার ছেলেরা করটিয়ার ২৪ পরগনার জমিদারদের কাছে থেকে একটি অংশ বিপুল অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয়। শুরু হয় জমিদারি। কালীচরণ সাহা ও আনন্দ মোহন সাহার উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র রায় চৌধুরী পর্যায়ক্রমে জমিদারি পরিচালনা করেন। এই শাসকরা এলাকায় বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, পানির ব্যবস্থাসহ অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। এখানে আছে বড় বড় ৩টি ভবন আর কাছারি বাড়ী । এই ভবন গুলো এবং কাছারি বাড়ীর নাম মহারাজ লজ, আনন্দ লজ, চৌধুরী লজ এবং কালীচরণ লজ। আরও আছে আত্মীয় স্বজন কর্মচারীদের থাকার বাড়ী এবং প্রার্থনার জন্য মন্দির। বাড়িতে প্রবেশের জন্য রয়েছে ২টি সুরম্য গেট। বাড়ীর সামনেই আছে বিশাল এক দীঘি, নাম বিশাখা সাগর। ভবন গুলোর পিছনে আছে পাসরা পুকুর এবং রানী পুকুর নামে দুইটা পুকুর। ভবন গুলোর সামনে সুন্দর ফুলের বাগান আছে। ভবন গুলো আর বিশাখা সাগর এর মাঝখানে রাস্তার পাশে কয়েকটা উঁচু গোল কারুকার্যময় স্তম্ভ আছে। কালীচরণ লজ-এর সামনে বেশ বড় একটা খোলা জায়গা বা মাঠ আছে।

জমিদার বাড়ীর পূর্বপুরুষেরা হলেন- বিদু সাহা, বুদ্ধ সাহা, হরেন্দ্র সাহা ও কালীচরণ সাহা। জনশ্রুতি আছে, জমিদার তরফের সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজ ভবনের গজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। তিনি ব্রিটিশ আমলে সম্মানিক বিচারক ছিলেন এবং একাধারে নীতিবান ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি পশু (বাঘ, হরিণ, ঘোড়া) ও পাখি (ময়ূর, টিয়া, ময়না) সহ বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি লালন-পালন করতেন। কাছারী বাড়ীতে বাঘের খাঁচা ছিল। বাঘটিকে আদর করে ফুলেশ্বরী বলে ডাকতেন।

জমিদার তরফের সন্তানেরা শুধুমাত্র বিশাল বিত্ত বৈভবের মালিক ছিলেন না। তাদের ছিল সুবিশাল চিত্ত। এলাকার মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে তারা বিদ্যালয়, মন্দিরসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। ১৮৯০ সালে মহেড়া আনন্দ উচ্চ বিদ্যালয়টি জমিদার বাড়ীর আনন্দ কুমার রায় চৌধুরীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপিনাথ জিওর বিগ্রহ মন্দির জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মন্দিরের

সামান্য উত্তরে আদিনিবাস ছিল। জমিদার ভবনের উত্তর পার্শ্বে তাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী শ্মাঁশাণ কালী মন্দির। জমিদার ভবনের দক্ষিণ পাশে বিশাখা সাগর অবস্থিত। এখান থেকে একসময় এলাকার জনগণ সুপেয় পানি সংগ্রহ করত। জমিদার বাড়ীর পিছনে পাসরা পুকুর এবং রানী পুকুর নামে বিশাল দুইটি দিঘি আছে যা ছিল জমিদারদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। পানির অভাব মেটানোর জন্য গ্রামে গ্রামে অনেক কূপ খনন করে দেন জমিদারগণ। মহেড়া থেকে এক কিলোমিটার দূরে ছাওয়ালী বাজারে এক সুবিশাল শ্রী শ্রী শ্মাঁশাণ কালী মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দৃষ্টিনন্দন এই জমিদার বাড়ীর রয়েছে এক কলঙ্কিত স্মৃতি। ১৯৭১ সালের ১৪ই মে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকবাহিনী মহেড়া জমিদার বাড়ীতে হামলা করে এবং জমিদার বাড়ীর কূলবধূ যোগমায়া রায় চৌধুরীসহ পাঁচজন গ্রামবাসীকে চৌধুরী লজের মন্দিরের পেছনে একত্রে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। তন্মধ্যে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক পন্ডিত বিমল কুমার সরকার, মনিন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, অতুল চন্দ্র সাহা এবং নোয়াই বণিক ছিলেন। ইতিহাস কলঙ্কিত সেই রক্তের দাগ এখনো লেগে আছে মহেড়া জমিদার বাড়ীতে। যে দেশের জন্য, যে দেশের মানুষের জন্য মহেড়া জমিদার পরিবার নিজেদের শত প্রাচুর্য ভুলে এলাকার উন্নয়নে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন, সেই এলাকার রাজাকার আল-বদরদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্থানী বাহিনীর এই চরম হত্যযজ্ঞে জমিদার পরিবার শুধু হতাশ হননি, শত বছরের সাজানো জমিদার বাড়ী আর কোটি টাকার সম্পদ ফেলে চরম ঘৃণা আর ক্ষোভ নিয়ে লৌহজং নদীর নৌপথে নৌকা যোগে চলে যান বাংলাদেশ ছেড়ে। অতঃপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বায়েজীদ সাহেবের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিবাহিনী জমিদার বাড়ীতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে পরিত্যাক্ত জমিদার বাড়ীটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ মহতী কাজটি করেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান। পুলিশের প্রশিক্ষণকে আধুনিক এবং যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে উন্নীত করা হয়। আর পুলিশের ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন হওয়ায় ট্রেনিং পরিচালনার জন্য জমিদার বাড়ীটির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণসহ নতুন নতুন স্থাপনা তৈরী করার কারনে পুরানো স্থাপত্য কলার অপরূপ এই জমিদার বাড়ীটির সৌন্দর্য্য শুধু অক্ষত থাকেনি বরং তার কলেবর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

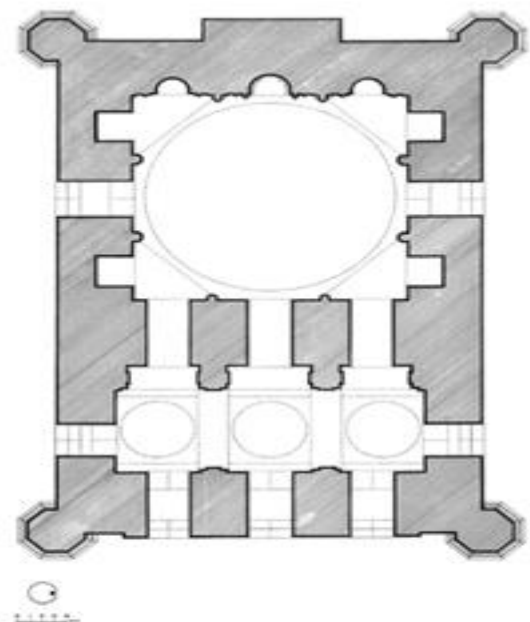
তৃতীয় অধ্যায়

স্থাপনা নির্মাণশৈলী ও বৈশিষ্ট্য

স্থাপনা নির্মাণশৈলী ও বৈশিষ্ট্য

আতিয়া মসজিদের স্থাপত্যিক বর্ণনাঃ





চিত্র: আতিয়া মসজিদের পার্শ্ববুরুজ ও ভূমি নকশা

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটি বারান্দাযুক্ত ইমারত। বারান্দায় তিনটি ও বর্গাকৃতির কিবলা কোঠার উপর একটি, মোট ৪টি গম্বুজ রয়েছে। এখানে মসজিদ স্থাপত্য নির্মাণে ও স্থান বিশেষেনির্মাণ উপকরনে, অবয়বে ভিন্নতা লক্ষণীয়। মসজিদটি কিবলা কোঠা ও বারান্দাসহ সার্বিক পরিমাণ ১৭.৭০ মি. × ১২ মি.। মসজিদের দেয়াল ২.২২মি. প্রশস্থ। কিবলা কোঠার অভ্যন্তরীণ পরিমাণ ৭.৫মি. × ৭.৫মি. আর বারান্দার পরিমাপ ৩.৮২মি. x ৭.৫মি.। মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। ভূমি পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে একটি বর্গাকার কিবলা কোঠা তার সামনে একটি লম্বা বারান্দা, চার কোনে চারটি বুরুজ এবং তিনদিকে মোট সাতটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এ মসজিদের জুল্লার উপরে একটি বড় গম্বুজ ও বারান্দার উপরে তিনটি ছোট গম্বুজ রয়েছে।

মসজিদের চার কোনের চারটি বুরুজই অষ্ট কোণাকার এবং প্রতিটি কার্নিসকে অতিক্রম করে উপরে উঠে গেছে। বুরুজগুলোর উপরের অংশে নিরেট ছত্রি নির্মিত হয়েছে। বুরুজ গুলোর নীচ থেকে উপর পর্যন্ত মুলডীর করা নকশায় অলংকৃত ছত্রিগুলোর অষ্টভুজের প্রতিটি বাহুতে একটি করে খোপ (প্যানেল) করে তার মাঝে বহুখাজ খিলানের নকশা করা হয়েছে। ছত্রিগুলোর শীর্ষে খাঁজকাটা বৃত্তাকার পাত্রের মোটিফ লক্ষণীয়। এ নকশাকৃত পাত্রের শীর্ষে স্থাপিত প্রস্ফুটিত পদ্মের নকশা কলস চুড়াকে বহন করেছে। মসজিদটির পূর্ব দিকের ফাসাদটি খুবই গুরুত্বপুর্ন নির্মাণ কৌশল ও অলংকরণ উভয় দিক থেকেই এটি তাৎপর্যমন্ডিত। ফাসাদের প্রবেশ পথের উপর সমান্তরাল একটি অগ্রসরমান মুল্ডডিং রেখা তৈরি করে ফাসাদকে দ্বিতল ইমারতের ন্যায় রূপদান করেছে।এ রূপ বৈশিষ্ট্য একলাখী সমাধি থেকে শুরু করে কুসুম্বা মসজিদ, বাঘা মসজিদসহ আরও অনেক ইমারতে পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বদিকের ফাসাদে[1] ৩ টি প্রবেশ পথ রয়েছে যার সবগুলোই দ্বিকেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট। মাঝের প্রবেশ পথটি অপর দুটি প্রবেশ পথের তুলনায় সামান্য বড়। এই প্রবেশ পথ পেরিয়ে মসজিদের সামনের বারান্দায় প্রবেশ করা যায়। বারান্দা থেকে মুল কিবলা কোঠায়

[1] ফাসাদ(facade)- প্রাসাদের সম্মুখভাগের অংশ।

সরাসরি প্রবেশ করা যায় না। জুল্লায় প্রবেশ করতে হলে বারান্দার আয়তাকার কক্ষ পার হতে হয়। জুল্লায় প্রবেশের দেওয়ালে রয়েছে তিনটি প্রবেশ পথ। অতএব পূর্ব ফাসাদে তিনটি এবং জুল্লায় প্রবেশের দেয়ালে আরো তিনটি প্রবেশ পথ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া কিবলা কক্ষের উত্তর ও দক্ষিন দেওয়ালে একটি করে দুটি এবং বারান্দাতেও উত্তর দক্ষিন দেওয়ালে অনুরূপ দুটি প্রবেশ পথ বিদ্যমান।

প্রবেশ পথ খিলান পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি না হয়ে স্তম্ভ ও তীর সহযোগে নির্মিত। মাঝের প্রধান মেহরাবটি অন্য দুটি মেহরাবের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতা বিশিষ্ট ও তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি অলংকৃত। প্রধান মেহরাবের দুপাশে দুটি অবং বারান্দার মাঝের প্রবেশপথের দুপাশে দুটি করে মোট চারটি সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। এ স্তম্ভ গুলো এদের গঠন ও অলংকরণ উভয় দিক দিয়ে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে।

আতিয়া মসজিদের গম্বুজের নির্মাণ কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, কিবলা কক্ষের উপর বড় গম্বুজটি খিলান ভিত্তিক নির্মাণ পদ্ধতি (স্কুইঞ্জ পদ্ধতি[2]) এবং বারান্দার উপর ছোট তিনটি গম্বুজ 'বাংলা পেন্ডেনটিভ[3] ' পদ্ধতিতে নির্মিত। 'স্কুইঞ্জ' বা 'পান্দানতিভ' এর উপর বৃত্তাকার উঁচু ড্রাম নির্মাণ করে তার উপর গম্বুজ গুলো নির্মাণের ফলে সুলতানি আমলের নিচু গম্বুজের তুলনায় এবং উচ্চতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ড্রামের উপরিভাগ মারলন নকশায় অলংকৃত।

বাংলার সুলতানি এবং মুঘল উভয় স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সতের শতকের শুরুতে নির্মিত আতিয়া জামে মসজিদ যুগসন্ধি লগ্নের মসজিদ স্থাপত্য নিদর্শন রূপে চিহ্নিত। আতিয়া জামে মসজিদে সুলতানি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে যথাক্রমে কার্নিশে, দ্বিকেন্দ্রিক সুচানো খিলান,গম্ভুজ নির্মাণে বাংলা পান্দানতিভ ব্যবহার এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে পোড়ামাটির টেরাকোটা নকশা অলংকারে একই সাথে এ মসজিদে মুঘল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি চিহ্নিত হয়েছে। ছাদের কার্নিশের উপর পর্যন্ত উঠে যাওয়া পার্শ্ববুরুজ, ড্রামের উপর গম্বুজের নির্মান, সুডৌল বৃত্তাকার গম্বুজের উপরে ফুটন্ত পদ্মের নকশা, কলসচুড়া 'মারলন'[4] নকশার ব্যবহার ইত্যাদিও দেখা যায়।

আতিয়া জামে মসজিদের ভূমি নকশাঃ আতিয়া জামে মসজিদের ভূমি নকশা আয়তাকৃতির হলেও কৌতূহলোদ্দীপক। সামগ্রিক ভাবে এটি আয়তাকার কিন্তু এর জুল্লাহ বর্গাকার এবং সামনের পূর্বদিকে বারান্দাযুক্ত। আতিয়া জামে মসজিদ ভূমি নকশার দিক থেকে আয়তাকার বারান্দাযুক্ত মসজিদ রীতির অন্তর্ভুক্ত।
বিদায়ী সুলতানি আর নবাগত মুঘল উভয়রীতির সংমিশ্রণে অপূর্ব এক স্থাপত্য ইমারত আতিয়া জামে মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্য বিকাশে সৃষ্ট একটি দৃষ্টিনন্দন, ব্যতিক্রমী ও অনন্য মসজিদ নিদর্শন।

সওদাগরী মসজিদ

ভূমি নকশা: ভূমি নকশার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এটা এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত, যার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.০৯৬মি.(২০ফুট)। চার কোণে রয়েছে চারটি গোলাকারপার্শ্ববুরুজ; আরও আছে উত্তর- দক্ষিনে একটি করে এবং পূর্ব ফাসাদের তিনটি এ নিয়ে মোট পাঁচটি প্রবেশ পথ।

মসজিদটির স্থাপত্যিক বর্ননাঃ মসজিদটিতে একসময় পুরোটাই পলেস্তরা করা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিতরের দেয়ালে পলেস্তরাকৃত কিছুটা অংশ রয়ে গেলেও বাইরে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চার কোনে চারটি গোলাকার পার্শ্ববুরুজ কার্নিশের উপর পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল। পূর্ব দিকের মসজিদের ফাসাদের প্রবেশ পথ তিনটি আয়তাকার ফ্রেমে নির্মিত হয়েছে। মাঝের প্রবেশ পথের উভয় পাশে জোড়া পলাস্টার রয়েছে যার নিচের অংশ সরু কলস আকৃতির।

---

2 স্কুইঞ্জ পদ্ধতি (Squinch)- দুটি দেয়ালের অভ্যন্তরীণ কোণ জুড়ে নির্মিত একটি ছোট খিলান (সাধারণত একটি চূড়াকে সমর্থন করার জন্য)

3 পেন্ডেনটিভ- বৃহৎ বৃত্তাকার সারফেস এর ছোট ছোট ত্রিভুজ আকৃতির তল

4 মারলন নকশা- ছাদের কিনারায় বা গম্বুজে ব্যবহৃত অলংকরণ

সবগুলো প্রবেশ পথই চতুকেন্দ্রিক খিলান যোগে নির্মিত; তবে ক্রমাগত দেয়ালের অংশ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং দেয়াল ভেঙ্গে যাওয়ায় খিলানের আকৃতি স্পষ্টভাবে চতুকেন্দ্রিক ভাবতে অসুবিধা হয়। মসজিদটির ছাদের একমাত্র গম্বুজটি উচু ড্রামের উপর স্থাপিত। স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। অভ্যন্তরে দুই স্কুইঞ্চের মধ্যবর্তী দেয়াল স্ট্র্যাকো নকশায় অলংকৃত।
এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনার মসজিদ সুলতানি আমল থেকে শুরু করে মুঘল আমল পর্যন্ত অসংখ্য নির্মিত হয়েছে। বাহ্যিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা থাকলেও ভূমি পরিকল্পনা দুই যুগে প্রায় একই রকম।

মহেরা জমিদার বাড়ির গঠন শৈলী

এখানে মহারাজ এবং আনন্দলজকে একত্রে রাখা হয়েছে এবং চৌধুরী লজ ও কালিচরণ লজের সাথে আলাদাভাবে যুক্ত আছে। এখানকার সবগুলো প্রাসাদ দক্ষিণমুখী। বিশাখা সাগর নামক দিঘীটি দ্বারের দক্ষিনে অবস্থিত। দুটি সরলরেখা গামী (rectilinean) একতলা ভবন যেগুলো কাছারি ও নায়েব ভবন নামে পরিচিত সেগুলো মহারাজ লজ ও আনন্দ লজের সামনের দিকে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

চৌধুরী লজ ও কালীচরণ লজ এর গেট সিংহ মূর্তি দ্বারা নকশা কৃত। কালিচরণ লজের আগে একটি মন্দির আছে এবং লজের পেছনে একটি মন্দির আছে।যার পিছনের আঙিনায় রানীমহল অবস্থান করছে।



চিত্র: মহারাজ লজ

মহারাজ লজঃ নির্মাণকাল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজ লজটি জমিদার বাড়ির সর্ববৃহৎ বাইজেন্টাইন স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত স্থাপনা।এতে রয়েছে সুপ্রশস্ত মোট ১০ টি কক্ষ।পশ্চিমা স্থাপত্য কলার মধ্যে প্রাচ্যের সৌন্দর্যের অপরূপ মিশেলে নির্মিত মহারাজ লজ।মহারাজ লজের পশ্চাৎ ভাগে নির্মিত টেনিস মার্টটি ছিল জমিদারদের নাট মন্দির। এবং উত্তর পার্শ্বে ছিল দূর্গা মন্দির। জনশ্রুতি আছে জমিদার তরফের সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজ ভবনের গজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী। তিনি ব্রিটিশ আমলে সম্মানিক বিচারক(Honorable magistrate) ছিলেন।

(মহারাজ লজ ভবনের সামনে ছয়টি (৬) টি কলাম রয়েছে। সেখানে সোনালী ও সাদা রঙের মহারাজ লজের সামনে রয়েছে সিঁড়ির বাঁকানো রেলিং ও ঝুলন্ত বারান্দা যা ভবনের শোভা বৃদ্ধি করেছে। ভবনটিতে মোট কক্ষ আছে বারো (১২) টি, সামনে বাগান ও পেছনে একটি টেনিসসহ কোর্ট রয়েছে। এই ভবনটি বর্তমানে শুটিং স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)



চিত্র: আনন্দ লজ

আনন্দ লজ: জমিদার বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভবন হলো আনন্দ লজ। নীল, সোনালী ও সাদা রঙের মিশ্রনে ভরা ভবনটির সামনে আট ৮ টি সুদৃশ্য কলাম রয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ঝুলন্ত বারান্দা এ ভবনকে করেছে আরো দৃষ্টিনন্দন। আনন্দ লজের সামনে হরিণ, বাঘ ও পশু-পাখির ভাস্কর্যসহ একটি চমৎকার বাগান আছে।



চিত্র: চৌধুরী লজ

চৌধুরী লজঃ জমিদার বাড়ি প্রবেশের পরেই মূল ফটক দিয়ে দেখা যায় চৌধুরী লজ। সোনালী সাদা রঙের ভবনটির পিলার গুলো রোমান স্থাপত্য শৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছে। সুন্দর নকশাখচিত এই ভবনের ভেতরে রয়েছে ঢেউ খেলানো ছাদ। দোতলা বিশিষ্ট এই ভবনটির সামনে রয়েছে সুন্দর বাগান ও সবুজ মাঠ।

কালীচরণ লজঃ জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির শেষের দিকে নির্মিত এই কালীচরণ লজ অন্য ভবন থেকে অনেকটা আলাদা। ইংরেজি ‘ইউ’ (U) অক্ষরের আদলে এই ভবনটি ইংরেজ স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। অন্যোন্য স্থাপত্য শৈলীর জন্য বিকেল বেলা ভবনের ভেতর থেকে সুন্দর আলোর ঝলকানি দেখা যায়।



চিত্র: কালীচরণ লজ ও মিউজিয়াম

মিউজিয়াম:

মূল গেট দিয়ে ঢুকতেই পাশে অসম্ভব সুন্দর নকশাখোচিত একতলা একটি ভবন। দূর থেকে দেখলে এর জ্যামিতিক নকশার কারণে একে কালীচরণ লজ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে হলেও এটি আসলে আলাদা। এই ভবনটি বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। এখানে মুঘল আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের ভাস্কর্য রয়েছে। এখানে আরো আছে অনেক জমিদারি চিহ্ন, আছে তাদের তৈজসপত্র। এগুলো দেখলে অতীতের আভিজাত্যপূর্ণ জমিদারদের জীবন কাহিনী চোখে ভেসে উঠে।








চিত্র: মিউজিয়ামের সংরক্ষিত জমিদার বাড়ির ব্যবহৃত জিনিসপত্র



অতিথি ভবন: চৌধুরী লজের ঠিক পশ্চাৎভাগে রয়েছে অতিথি ভবন। জমিদারদের নির্মিত এই সুরম্য ভবনের দুইপাশে আছে দুইটি ভিআইপি রুম। মাঝখানে ডাইনিং রুমের অবস্থান। সুপ্রাচীন নবাবী স্থাপত্যের আদলে নির্মিত অবয়বের মাঝে সুবিশাল দরজায় সেগুন কাঠের নকশা এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে অতিথি ভবনটি হয়ে উঠেছে প্রাচীন স্থাপত্য ও আধুনিক অভ্যন্তরীন শৈল্পীকতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক অনুপম ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা।



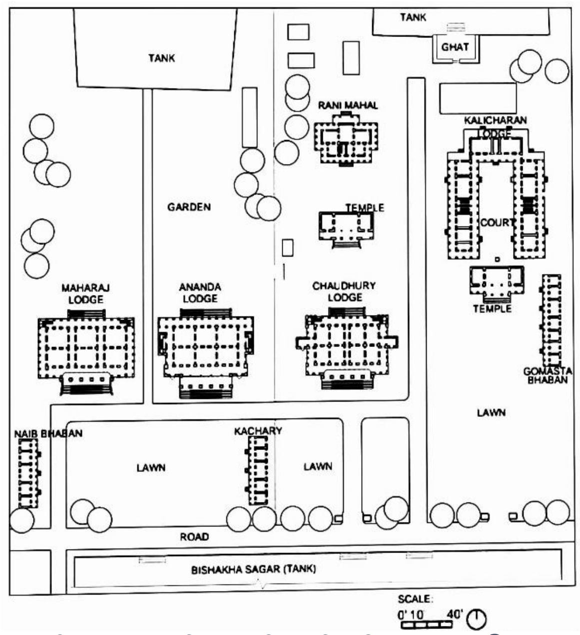
রানীমহল: অতিথি ভবনের উত্তরপাশে রানীমহলের অবস্থান। বিশেষ স্থাপত্যশৈলী মন্ডিত এ ভবনটিতে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত জমিদার নন্দনদের জন্য। রানীমহল স্থাপত্য শৈলীতেও ফুটে উঠেছে জমিদার কুলের শৈল্পিক মননের অনন্য প্রকাশ। রানীমহলের সাথে আছে বেশকয়েকটি টিনশেড শ্রেণিকক্ষ। পিটিসি'র প্রশিক্ষণার্থীর জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। শ্রেণিকক্ষের পরেই রানী পুকুর। রানী পুকুর জমিদারকুল নির্মিত অভিজাত ঘাটের অংশ এখনো বিদ্যমান। জমিদার নন্দিনীগণ এ ঘাটে স্নান করতেন বলে কথিত আছে।

এছাড়া, এই জমিদার বাড়ির পিছনের অংশে রয়েছে পাশরা পুকুর ও রানী পুকুর। এগুলোতে ইটের তৈরি ঘাট রয়েছে। মহারাজ লজ এর পেছনে একটি পারিবারিক উপাসনালয় এর ধ্বংসস্তূপ আছে বলে পুলিকা একাডেমী থেকে প্রকাশিত পুস্তক থেকে জানা যায়।





মহেরা জমিদার বাড়ির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য:



চিত্র: মহেড়া জমিদার বাড়ির ভূমি পরিকল্পনা(সংগৃহীত)

মহেরা জমিদার বাড়ির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়- কম্পাসের কাটার নিরিখে অবস্থান নির্ণয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিটি তার প্রধান কাঠামোর সাথে দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে।

- প্রবেশদ্বার- ২টি প্রবেশদ্বার আছে। যাতে সিংহের মূর্তি সম্বলিত নকশা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিনন্দিত প্রবেশদ্বার ছিল চমৎকার।
- দালানের গঠন - মহারাজ লজ দ্বিতল বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ধাচের প্রাসাদ।এই প্রাসাদের স্তম্ভ শ্রেণি হেক্সা ডিজাইন (Hexa style)[5] দ্বারা গঠিত।
- আনন্দ লজ অক্টা স্টাইলের স্তম্ভ ও এর মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার অলংকৃত বারান্দা ঝুলানো রয়েছে যা প্রাসাদটির চমৎকার রূপ দান করেছে।
- মহারাজ লজের মতোই চৌধুরী লজের স্থাপনা বৈশিষ্ট্য। শুধু পার্থক্য আছে প্রাসাদ দুটির সম্মুখভাগের উপরিদেশে ত্রিকোণ গঠন বিশিষ্ট ঝুলন্ত নকশার মধ্যে।
- কালিচরণ লজ এর আকার U/ইউ এর মত। এতে তিনটি সিঁড়ি রয়েছে উপরের ঘরগুলোতে যাওয়ার জন্য। ব্লকটির সম্মুখভাগ মাঝারি প্রাচীর এবং এতে ২০ টি বিভিন্ন সাইজের কামরা আছে।
- কোর্ট বা কাছারি -ইউ আকৃতির কাঠামো যুক্ত একটি কাছারি বা দরবার ঘর কালিচরণ লজে যুক্ত আছে।
- তিনটি জলাশয়ের মধ্যে দুইটি জমিদার বাড়ির পেছনের অংশে এবং অন্যটি জমিদার বাড়িতে প্রবেশের সময় সম্মুখভাগে দেখা যায়।
- প্রাসাদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত কামরা ও বহির্ভাগে কাচারি বা দরবার ঘর ছিল।
- প্রাসাদ দক্ষিণ মুখী থাকায় প্রাসাদের দরজা জানালা খুলে দিলে দখিনা হাওয়া ও সূর্যের আলো পর্যাপ্ত ভাবে পাওয়া যেত।তাই প্রাসাদ মুখ দক্ষিনে রাখা হয়।

[5] হেক্সা স্টাইল -দালানের সম্মুখভাগে ছয়টি কলাম আছে এমন।(হেক্সাস্টাইল বিল্ডিংগুলিতে ছয়টি কলাম ছিল এবং প্রাচীন গ্রীক ডোরিক আর্কিটেকচারে 600-550 B.C থেকে পেরিক্লেস 450-430 B.C পর্যন্ত প্রাচীন যুগের মধ্যে আদর্শ ডিজাইন ছিল।)

ধর্মীয় স্থান:

এই জমিদার বাড়িতে দুইটি মন্দির রয়েছে।

১) ঠাকুর দালান: এটি চৌধুরী লজের পেছনের ভাগে অবস্থিত।

২) কালীচরণ লজের সাথে অবস্থিত মন্দির। যা দক্ষতার সাথে লিভিং ইউনিটের সাথে যুক্ত আছে এবং এটি খুবই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য তৈরি করেছে।

নির্মাণ প্রযুক্তি ও উপাদান:

১.প্রাচীর: ১৬ ইঞ্চি পুরতের প্রাচীর দেখা যায়।

২.ছাঁদ: Rafter[6] , Iron Joist বা লোহার পাত, কড়িকাঠ, কাদামাটির ইটের তৈরি সমতল টাইলস এবং চুন মসলার কংক্রিট দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি প্রাসাদের ছাদের সম্মুখভাগের নকশা আলাদা।

৩. প্রাসাদের শুরুতে ৪’-৬’ প্রশস্ত একটি তোরণ আছে। এখানে স্তম্ভশ্রেণি ও চৌকাট দেখা যায় ।

৪. স্তম্ভ: কোরিন্থিয়ান এবং যৌগিক ধাচের স্তম্ভশ্রেণী ভূমির সাথে যুক্ত আছে ঢালাইকৃত লোহার ও ইটের কলাম দ্বারা।

৫. জানালা - জানালাগুলো ৩”-১০” পর্যন্ত প্রশস্ত। এখানে কাঠের প্যানেল, লোহার কব্জা এবং খিল বা বল্টু ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে।

৬. দরজা - দরজার উচ্চতা ৮’-১০”। এখানেও কাঠের প্যানেল, লোহার কব্জা এবং খিল বা বল্টু ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে।

৭.মেঝে- লোহার পাত, কাদামাটির ইটের তৈরি সমতল টাইলস এবং চুন মসলার কংক্রিট দ্বারা তৈরি।

৮. সিঁড়ি - ইটের তৈরি এবং কাঠ ও ধাতব রেলিং যুক্ত সিঁড়ি দেখা যায়।

৯.অলংকরণ - পাশ্চাত্য ধাচের উপাদান গুলো অট্টালিকার সম্মুখভাগের উপরিদেশে ত্রিকোণ গঠনবিশেষে দেখা যায়। বিভিন্ন খিলান, স্তম্ভমূলসহ, নকশাকৃত স্তম্ভ, বারান্দা, crown cornice[7] দেখা যায়।

১০.Facade / সম্মুখভাগ: প্রাসাদের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্নতত্ত্বের প্যালেডিয়ান[8] শৈলী গ্রহণ করেছে।

১১. ছাদের কিনারায় নিরাপত্তামূলক পাচিল বা বাঁধ দেওয়া আছে।

১২.প্রাসাদের সিড়ির রেলিং এবং উপরিভাগের সাজসজ্জায় শিকলের ন্যায় শৃংখল অলংকরন, ফুলদানির নকশা, কলস, ধাতব এবং কাঠের খোদাইকৃত নকশা দেখা যায়।

১৩.মিউজিয়াম: কালিচরণ লজের সাথে সংযুক্ত মিউজিয়ামে জমিদারদের ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র ও শৌখিন জিনিস সংরক্ষিত আছে।

---

6 Rafter- ছাদের কাঠামো গঠনে, ছাদের আচ্ছাদন গঠনে এবং ছাদের ঢালুতে ব্যবহৃত কাঠামোগত ডিজাইন।

7 Crown cornice- ছাদের অব্যবহিত নিচে কক্ষের চারিদিকে দেয়ালে অলংকারিক নকশা

8 প্যালেডিয়ান স্টাইল - একটি ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলী যা ভেনিশিয়ান স্থপতি আন্দ্রেয়া প্যালিডিও (১৪০৮-১৫৮০) এর কাছ থেকে উদ্ভূত।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
স্থাপনা সংরক্ষণের উপায় ও সুপারিশ মালা

ক্ষয়িষ্ণু অংশ



চিত্র: আতিয়া মসজিদের ক্ষয়প্রাপ্ত টেরাকোটার নকশা

১. আতিয়া মসজিদের টেরাকোটা গুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ইটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফাসাদ বা সম্মুখভাগের পিলার গুলোর চূড়ার কারুকাজ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। স্থানীয় একজন প্রবীণ ব্যক্তি(বয়স-৮০) থেকে জানা যায় এই মসজিদের বর্তমান রংটি সংস্কারের পর করা হয়েছে। যার স্থায়িত্ব অনেক বেশিদিন নয়। রং করার পূর্বে এই মসজিদের উপরিভাগে ও কালো ছোপ ছোপ দাগ ছিল বলে জানা যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া এর জন্য দায়ী।



চিত্র: সওদাগরি মসজিদের ক্ষয়প্রাপ্ত ইট

২.সওদাগরী মসজিদের অস্তিত্ব ধ্বংসপ্রায়। এবং এর ইট গুলো প্রায় ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। আতিয়া মসজিদের সমসাময়িক হলেও এই স্থাপনাটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কেন জানা যায় না।



চিত্র: আনন্দলজের পেছনের দেয়াল

৩.মহেরা জমিদার বাড়ি পুলিশের হস্তগত থাকায় এটি অনেকটা সংরক্ষিত আছে। তা সত্ত্বেও প্রাসাদের পেছনে দেয়ালগুলোতে রংয়ের আস্তরণ উঠে আসছে। তবে পরিদর্শনকৃত অন্যান্য স্থাপনা থেকে এই প্রত্নস্থানটি অধিক সংরক্ষিত বলে আমি মনে করি।

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের প্রত্ন নিদর্শন গুলোর প্রায় জাদুঘর বা সংরক্ষিত স্থানে থাকলেও প্রাচীন স্থাপনা যেমন; মসজিদ, মন্দির, দালান, পুকুর দিঘীর অস্তিত্ব প্রভৃতি স্থানে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। কালের পরিক্রমায় এগুলো ক্ষয় হয়ে আসছে।অনেক স্থাপনা, পুকুর দিঘী, স্থাপনার অলংকরণ শৈলী এখন বিলুপ্তপ্রায়। পরিত্যাক্ত এসব স্থানের স্থাপত্য জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তাই ঐতিহাসিক মসজিদ, মন্দির, দালান সংস্কার ও সংরক্ষণ খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রত্যেক জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। অথচ আমাদের দেশের এই মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষণে যথাযথ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যের সাক্ষ্য মহামূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন স্থাপত্য কাঠামো ও নিদর্শন। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

সুপারিশ মালা

আমার মাঠকর্ম গবেষণা প্রতিবেদনে সংযুক্ত প্রত্নস্থানগুলো আতিয়া মসজিদ, তৎসংলগ্ন ক্ষয়িষ্ণু সওদাগরী মসজিদ এবং মহেড়া জমিদার বাড়ি। এই প্রত্নস্থানগুলো আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ। এ সকল প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে পারবে।তাই আমাদের কিছু করণীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন:

- প্রত্নস্থান ভ্রমণ করে নতুন নতুন ইতিহাস জানা ও অন্যের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সুপারিকল্পিত ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই ইতিহাস গুলো সহজ ভাবে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই প্রত্নস্থানগুলো সকলের কাছে পরিচিত করা এবং প্রত্নস্থানগুলোর প্রতি আকর্ষন আনা প্রয়োজন।
- লিফলেট প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক স্থানের প্রতি আকর্ষণ জাগানো।
- স্থানীয় জনগণকে প্রত্নস্থান গুলোর প্রতি উৎসাহিত করা। স্থানীয়দের থেকেই ইতিহাস সংগ্রহকারীরা পাবে মৌখিক সাক্ষাৎকার। অনেক সময় স্থানীয়রা পরিদর্শনকারীদের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে চাই না। এছাড়া প্রত্নস্থানের নিরাপত্তার সুবিধার্থে স্থানীয়দেরকে সবার আগে প্রত্নস্থানের গুরুত্ব বোঝানো ও উৎসাহী করা প্রয়োজন।
- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পাশাপাশি জনগণকে প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহী করার লক্ষ্যে বছরে অন্তত একবার সচেতনতামূলক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রত্নস্থান দেখভালে লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে আগ্রহীদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিয়োগ করা যারা সর্বক্ষণ প্রত্নস্থানে সার্বিক খেয়াল রাখবে।যেমন: দর্শনার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া। মসজিদের ভেতরে যেহেতু সকল ধর্মের মানুষকে স্থানীয়রা ঢুকতে দিতে চায় না, তাই এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রত্নস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা সেটা দেখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে প্রতিনিয়ত রিপোর্ট করা ইত্যাদি তাদের কাজ হবে।
- মহেরা জমিদার বাড়ি পুলিশের অধীনে থাকায় অনেকটা নিরাপদে আছে। সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি পালন করে পর্যটকদের এখানে চলাচল করতে হয়।ফলে জমিদার বাড়ির কোন অংশের ক্ষতি সাধন করা কারো পক্ষে সহজে সম্ভব নয়।
  উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- মুক্তগাছা জমিদার বাড়ি; ময়মনসিংহ এর কথা। এখানে জমিদারদের রেখে যাওয়া অট্টালিকা, মন্দির ও তৎসংলগ্ন মূল্যবান স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে আছে। যদিও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে তারপরও মহেরা জমিদার বাড়ির মত সঠিক ব্যবস্থাপনা, সংস্কার, সংরক্ষণ, নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা না থাকায় এই জমিদার বাড়িটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি।
- জমিদার ভবনের পেছনে আছে শিশু পার্ক। যাতে দোলন, স্লিপার, নাগরদোলা, রেলসহ যাবতীয় শিশুতোষ রাইড রয়েছে। আমার মতে, এরকম ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে স্থির রাখা উচিত। শিশুদের বিনোদনের জন্য রাইড স্থাপন করে শিশুদের ও অভিভাবকদের মনোযোগ জমিদার বাড়ির সৌন্দর্য, সঠিক ইতিহাস জানা থেকে সড়ে যাবে। আর

বিনোদনমূলক এসব রাইড এর কারণে জমিদার বাড়ির পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন, বিশৃংখল, শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে আমি মনে করি।

- আতিয়া মসজিদের ক্ষেত্রে- এর সংরক্ষণ ঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না, এই প্রত্নস্থানের দেওয়ালে সাদা, সবুজ শেওলা সহ কালো ছোপ ছোপ তার দেখা দিয়েছ। এছাড়া টেরাকোটার দৃষ্টিনন্দন নকশাগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।
- বাইরের দেশের মতো আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যগুলো যেন প্রত্ন নিদর্শনের মৌলিক ভিত্তির কোন পরিবর্তন না করে সংরক্ষণ করা যায় তাই ভালো মানের শিল্পী দ্বারা সংরক্ষণ কাজ পরিচালনা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

প্রস্তাবনা ও সীমাবদ্ধতা

উপসংহার

প্রাচীনকালের ইতিহাস জানতে গেলে ধারাবাহিক অনুসন্ধানের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে বিভিন্ন সূত্র, অনুকল্প দ্বারা এমন একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যা মানুষের অতীত জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিকে বুঝতে সহায়তা করে।বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা উন্নত দেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চার মত নয়। অতীত এর ইতিহাসকে বর্তমানে রূপ দেওয়াই প্রত্নতত্ত্বের কাজ, এজন্য প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অনুসন্ধানের ফলে আমরা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলোর প্রকৃত ও নিগূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারি। আমাদের দলগতভাবে টাঙ্গাইলে চালানো ক্ষুদ্র মাঠকর্ম গবেষণাটি ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে এই অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করার। কালের সাক্ষী হয়ে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব বলে মনে করি। এ অঞ্চল নিয়ে আরও বিস্তারিত কাজ করলে শুধু আতিয়া মসজিদ ও মহারাজ জমিদার বাড়ি নয় বরং সমগ্র টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এজন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক দেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই অঞ্চলে বিস্তর অনুসন্ধানমূলক ও গবেষণামূলক মাঠকর্ম পরিচালনা করতে হবে।

আতিয়া মসজিদ ও মহেরা জমিদার বাড়ি পরিদর্শন,পর্যবেক্ষণ করে আমরা এ দুটি স্থাপনার মধ্যে তুলনা করতে পারি যা আমাদের মাঠকর্মে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন। আতিয়া মসজিদ সুলতানি ও মুঘল যুগের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে এবং নির্মাণকাল ১৬০৯ খ্রিঃ।এর অপরূপ টেরাকোটা নকশা,স্থাপনা কাঠামো ছিল অভিনব। তেমনি মহেরা জমিদার বাড়িও নিজস্ব সৌন্দর্য ও গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টাঙ্গাইল শহরের মহেরা গ্রামে। এর গঠনশৈলীতে পাশ্চাত্য ধাচসহ মোগল রীতিও অনুসরণ করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে স্থাপনা দু'টির নির্মাণ শৈলী আলাদা। কিন্তু সৌন্দর্য, দৃষ্টি আকর্ষণ ও ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে উভয়ে নিজ নিজ অবস্থানে সমান গুরুত্ব বহন করছে। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি প্রত্নস্থান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে ইতিহাসকে জানা ও প্রত্নস্থান সংরক্ষণ করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দেশের ইতিহাসকে উজ্জীবিত রাখা।

সর্বোপরি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে । বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, জাতিসত্তা বিকাশের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা উদ্ঘাটনে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলো অনন্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের সকলের উচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ, যত্ন ও এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করা।

প্রস্তাবনা

টাঙ্গাইল জেলায় আমাদের মাঠকর্ম পরিচালনা করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করছি।

১. অনুসন্ধানকৃত অঞ্চলের বিস্তৃতির সাপেক্ষে প্রয়োজনে ব্যাপক অনুসন্ধানের এবং অতীত মানুষের বসতির সাপেক্ষে তৎকালীন সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে প্রাচীন ও আধুনিক দুটো সমাজকে তার সংস্কৃতির মাপকাঠিতে তুলে ধরা।
২. প্রত্নস্থান ও এর আশেপাশে মানুষের বসবাসের ফলে প্রত্নস্থানগুলো ধ্বংসের সম্মুখীন। এক্ষেত্রে সরকারীভাবে এগুলো সংরক্ষনের কঠোর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও পেশাজীবী সকলের মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
৩. প্রত্নস্থানগুলো থেকে লোকজনের নিয়ে যাওয়া প্রত্নবস্তুগুলো সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে।
৪. ইতিহাসে পঠিত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য প্রাচীন বসতিময় স্থানগুলো পরিভ্রমণ করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এর মাধ্যমেই সঠিক ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব।
৫. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর যেহেতু দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সেহেতু টাঙ্গাইল জেলার সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আশু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়ে ও কাগজে কলমের মাধ্যমেই তাদের সেই দায়িত্ব সম্পন্ন হতে পারেনা । এছাড়াও উৎখনন ও অনুসন্ধানের জন্য আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে প্রত্নস্থানটির সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। পাশাপাশি ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের উচিত প্রত্নস্থানটি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা।

সীমাবদ্ধতা

টাঙ্গাইল জেলার প্রত্নস্থানের অনুসন্ধান কার্যক্রম ২০২৩ এ চতুর্থ বর্ষ স্নাতক (সম্মান) পর্বের মাঠকর্মের অংশ হিসেবে আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানে অংশগ্রহণ করি। এ প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননে, গবেষনায় যেমন রয়েছে অপ্রতুলতা তেমনি এ অঞ্চলে আমাদের পরিচালিত মাঠকর্মেরও ছিল কিছু সীমাবদ্ধতা, যা নিম্নরূপ-

- আমাদের অনুসন্ধান পরিকল্পনা ৩দিন এবং ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে করার পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও দেশের সার্বিক অবস্হার প্রেক্ষিতে এ স্থানে ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত সময় ছিল নিতান্তই কম।
- টাঙ্গাইল জেলার প্রত্ননিদর্শনের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের স্বল্পতা।
- টাঙ্গাইল জেলার প্রত্নক্ষেত্রগুলোর ব্যাপক পরিসরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়নি বিধায় এগুলোর নিন্ম অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি।
- কিংবদন্তী দ্বারা প্রভাবিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহে সমস্যা দেখা দেয়।
- স্থানীয় জনগণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে প্রতিনিয়ত গবেষককে বিবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে বিব্রত করে থাকেন।
- অনেক দ্রুত জরিপ কাজ সম্পন্ন করায় অধিক তথ্য আহরণ করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তার স্বল্পতা ছিল।
- এছাড়া জমিদার বাড়ির ভেতরের কক্ষ ও বারান্দা কাছ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে না পারায় সেখান থেকে আমরা তেমন তথ্য আহরণ করতে পারিনি।
- সংস্কারের সময় পূর্বের চেয়ে স্থাপত্যগুলোর রং, আস্তরণ, নকশা পরিবর্তন হয়। ফলে সঠিকস্থাপত্য চিত্র আমরা দেখতে পাই না।

এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টাঙ্গাইল জেলাস্হ নির্ধারিত এলাকার প্রত্ননিদর্শন সমূহের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

পরিশিষ্ট



চিত্র: মহারাজ লজের সম্মুখভাগের কাছারিবাড়ী ও বারান্দা



চিত্র: আনন্দলজের ঝুল বারান্দা ও পেছনের দিক



চিত্র: রানী মহল



চিত্র: মহেড়া জমিদার বাড়ি প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা



চিত্র: মহেড়া জমিদার বাড়ির স্তম্ভশ্রেণীর নকশা



চিত্র: আতিয়া মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ, মেহরাব ও টেরাকোটা নকশা



চিত্র: ১০ টাকায় আতিয়া মসজিদ



চিত্র: আতিয়া মসজিদের দেয়ালে লাগানো বক্রাকার টেরাকোটা নকশা



চিত্র: আতিয়া মসজিদে পূর্ব দিকে ঢালাইকৃত কবর



চিত্র: মহেড়া জমিদার বাড়িতে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মিলিত আলোকচিত্র

তথ্যসূত্র

1. ড. শিরিন আক্তার, ভাষান্তর: সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান; শোবে বাংলার জমিদার ও জমিদারী (১৭০৭-১৭৭২); দিব্যপ্রকাশ (৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০); ফেব্রুয়ারি ২০১৮

2. মো. নুরুল কবির ভুঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) - রিসার্জ পেপার থেকে সংগৃহীত তথ্য

3. সুফি মুস্তাফিজুর রহমান; প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (৫, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, ঢাকা ১০০০); ডিসেম্বর ২০০৭।

4. প্রত্নতত্ত্ব, Vol.10 June-2004; Journal of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University.

5. AKM Zakariah; The Archaeological Heritage of Bangladesh; Asiatic Society of Bangladesh (Nimtali, Ramna, Dhaka1000); November 2011.

6. Ahmed, Abu Sayeed Mustaque; Mosque architecture in Bangladesh; UNESCO office in Dhaka;2006

7. খান, শামসুজ্জামান, ২০১৪, বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা টাঙ্গাইল জেলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

8. ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, ২০০৬, ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে, শেত প্রকাশ, ঢাকা ।

9. খান, নুরুল ইসলাম (সম্পা), ১৯৯০, বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, ঢাকা।

10. বেগম, আয়শা, ১৯৯৯, টাঙ্গাইল জেলার স্থাপত্যিক ঐতিহ্য, শিল্পাকলা একাডেমী, ঢাকা।

11. মাহবুব, খান, ২০১১, টাঙ্গাইল জেলার পরিচিতি, পলল প্রকাশনী, ঢাকা ।

12. মনসুর, মোঃ হোসেন, ১৯৯৮ কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

13. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল ১৯৯৬, বাংলাদেশের মসজিদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

14. নুরুজ্জামান, মোহাম্মদ, ২০০৭, বাংলাদেশের জেলা-উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।

15. ইসলাম, অধ্যাপক মুফাখখারুল, ১৯৯১, টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

16. হোসেন, এবিএম, ১৯৭৮, সুলতানী বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি পর্যালোচনা, ইতিহাদ পরিষদ, ঢাকা।

17. চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার, ১৯৯৯, ভারতবর্ষের প্রাক ইতিহাস, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা ।

18. Khan, F.A.H. 1991. Geology of Bangladesh, Dhaka: The University Press Ltd.

19. Rashid, H., 1996. Geography of Bangladesh, Dhaka: The UniversityPress Ltd.

20. www. Banglapedia.com

21. www.wikipedia.com

22. maheraup.tangail.gov.bd

23. tangail.govt.bd

24. www.prothomalo.com/Bangladesh

25. www.bd journal. Com

সমাপ্ত